সম্পর্কহীনতার কথা ঃ কিছু উদ্বেগ

সৌমিত্র বসু

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে একদিকে যেমন পৃথিবীর আকার ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে, অন্যদিকে তেমনই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। অন্যের জন্যে কাজ করা তো অনেক দূরের কথা, অন্যের কথা ভাবা, এমন কি অন্যের কথা শোনার প্রবণতা কমে যাওয়াটাই এই মুহূর্তে 'স্বাভাবিক' বলে গণ্য করা হয়; এর অন্যথাটা ব্যতিক্রম রূপে চিহ্নিত। পাশ্চাত্ত্যে এটা এতটাই শক্তিশালী ও স্বীকৃত বাস্তবতা যে ওদেশের মানুষকে মন-প্রাণের কথা বলার জন্য পেশাদার কাউন্সেলরদের কাছে যেতে হয়। আমাদের সমাজেও মানবিক সম্পর্ক কি এই একই পরিণতির দিকে এগোচ্ছে? পাশ্চাত্ত্যের আর্থসামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর গঠনগত পরিবর্তনের ধারা আমাদের সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোর ওপর যে ধরণের প্রভাব ফেলে চলেছে তার নিরিখে দেখলে সিঁদুরে মেঘ তো চোখে পড়বেই!

বস্তুতপক্ষে মানবিক সম্পর্কের মানচিত্রে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও আমরা এ বিষয়ে উদ্বেগ দেখতে পাই। মানব-সমাজকে ধরে রাখে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন 'আত্মীয়তা'। এই 'আত্মীয়তার' বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক। এই আত্মীয়তা বিস্তৃত হতে পারে আন্তর্জাতিক মানবতার সীমায়। বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথ জানতেন সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মীয়তার আধ্যাত্মিক অথবা আন্তর্জাতিক সামাকে স্পর্শ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তিনি কখনও দাবীও করেন নিযে সাধারণ মানুষের আত্মীয়তাবোধকে এতটা প্রসারিত হতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে মানুষ তার নিজের পরিবারের সীমার বাইরে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে ক্রমাগত অনাগ্রহী হয়ে উঠছে। 'পল্লী-সমাজের' মানুষদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কহীনতা রবীন্দ্রনাথকে উদ্বিগ্ন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ

"…. আমাদের খুব একটা বড় সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারে না। … মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছো।"

রবীন্দ্রনাথের এই উৎকণ্ঠা আজ থেকে সত্তর বছরেরও আগের কথা। এই দীর্ঘ সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এসেছে নানান পরিবর্তন। সভ্যতা ক্রমশঃ শহরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন শু হয়েছিল শহর কেন্দ্রিকতার সূত্রে। 'একক পরিবার' পার হয়ে এখন আমরা 'আরও ছোট একক পরিবারের' ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। জীবনসংগ্রামের জটিলতা বাড়ছে, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাচ্ছে। এই সব পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তার ক্ষেত্রে গুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে কি না সে বিষয়ে আমাদের দেশে কোন সমীক্ষা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আগে কেমন ছিল এবং এখন কী দাঁড়িয়েছে তা বিশ্লেষণের আলোয় মানবিক সম্পর্কহীনতার গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মানবিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তার তিনটি ধারা বা স্তরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিস্তৃতির দিক থেকে এই স্তর বিন্যাস করলে প্রথম স্তরে থাকবে সেইসব মানুষের সাথে সম্পর্ক যারা সাধারণ অর্থে আত্মীয় বলে গন্য নন। পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীরা এই

স্তরে অন্তর্ভুক্ত হবেন। পরবর্তী স্তরে রয়েছেন সেইসব মানুষ যারা একক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ন'ন অথচ যাদের সাথে পরিব ারের সম্পর্ক রয়েছে। যৌথ পরিবার এবং তার বাইরের আত্মীয়েরা এই স্তরের আওতায় আসবেন। সব শেষ স্তরে রয়েছে একক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ।

পাশ্চাত্যে উপরিউক্ত তিনটি স্তরের ক্ষেত্রেই সম্পর্কহীনতা যতটা প্রকট আমাদের দেশে ততটা না হলেও এদেশেও মানুষের পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ার ইঙ্গিত যথেষ্ট স্পষ্ট। পাড়া-প্রতিবেশীর, বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পল্লী-সমাজের সাথে সম্পর্কের কথাটাই প্রথমে আলোচনা করা যাক। আগে পাড়া প্রতিবেশীরা শুধু যে পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হত তাই নয়, প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে এক বাড়ীর শিশু সন্তান স্বচ্ছন্দে অন্য বাড়ীতে মানুষ হত; ও বাড়ীর ছেলের আচরণে কোন অন্যায় দেখলে এ বাড়ীর মা-মাসীরা তাকে শাসন করতে দ্বিধা করতেন না। কোন প্রতিবেশীকে প াড়ায় কয়েকদিন দেখা না গেলে অন্যেরা উদ্বিগ্ন হতেন। প্রতিবেশীটি ফিরে এলে জিজ্ঞেস করতেন তার অনুপস্থিতির ক ারণ। হ্যাঁ, নিঃসঙ্কোচেই জিজ্ঞাসা করা হত — একদম নিজের কাছের মানুষকে যে মানসিকতা নিয়ে কুশল জিজ্ঞাসাকে সংশয় বা বিরক্তির চোখে দেখতেন না। এমনই ছিল আন্তরিকতার মাত্রা। কারও বিপদ হলে অন্যদের ডাকতে হত না। ত ারা আপনিই এসে জড়ো হতেন। একজনের বিপদ যেন সবারই বিপদ। সুখের ভাগ নেওয়ার ক্ষেত্রেও অভিব্যক্তি একই রকম আন্তরিক। 'যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই' জাতীয় প্রবাদ এমনি এমনি আসে নি। পড়শীর সাথে অ াত্মীয়তার এই ছবিটা ধীরে ধীরে অনেকটাই বদলে গেছে। আমার ছেলের ভাল-মন্দ নিয়ে আশেপাশের মানুষ উদ্বিগ্ন হচ্ছে দেখলে আমরা এখন নিজের অজান্তেই হয়তো মনে করি 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী!' 'এতদিন দেখিনি কেন' গোছের প্রশ্নকে এখন 'অহেতুক কৌতূহল' বলে চিহ্নিত করার প্রবণতাই বেশী। সামগ্রিকভাবে 'পরের ব্যাপারে নাক না গলানোর' নীতিই এখন পড়শীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করতে শু করেছে। রবীন্দ্রনাথের সময়েই শহরের ম ানুষদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব এই মাত্রা পেয়ে গিয়েছিল। কলকাতার মানুষদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''কলিক াতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি না।'' রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে মফস্বল শহর এবং গ্রামাঞ্চলেও যে এই সম্পর্কহীনতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহের বোধহয় অবকাশ নেই। এখন সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাট াই প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'বিয়ে, অন্নপ্রাশন' ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে আগে প্রতিবেশীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করত। এখন অংশগ্রহণের স্থান নিয়েছে স্রেফ 'নিমন্ত্রণ রক্ষা'। যে অনুষ্ঠানে আমি যাচ্ছি সেট া আমারও অনুষ্ঠান এই বোধটা এখন খুব কম কাজ করে, সেই জন্যই হয়তো আমরা এইসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষার পর অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের বিরক্তি প্রকাশ করি। সম্পর্কহীনতা যত বাড়ছে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি তাদের প্রাসঙ্গিকতা হা রিয়ে তত বেশী করে যান্ত্রিক আচার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় স্তরের আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও সম্পর্কের গভীরতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে যাদের স াথে শুধু যে স্থানিক দূরত্বই বেড়েছে তা নয়, মানসিক দূরত্বও যেন বেড়ে গেছে। যারা যৌথ পরিবারের অঙ্গীভূত ছিল না, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য, একটা সময় ছিল যখন আত্মীয়রা পরস্পরের বাড়িতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের হাট বসে যেত। আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে কোন নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল না। বিনা নোটিশে অসময়ে একজন অন্যের বা ড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারতেন। এতে অনেক সময়ে অন্তঃপুরিকারা কিছুটা অসুবিধায় পড়লেও তাদের উদ্যোগ আয়ে

াজন এবং আচার-আচরণে আন্তরিকতার কোন অভাব থাকত না। ছুটির দিনে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে। বিনা নোটিশে গেলে অজস্র 'টেনশন' কাজ করে আমার যাওয়াটা ওনারা পছন্দ করবেন কিনা, ওদের 'প্র াইভেসি' কোনভাবে বিঘ্নিত হবে কি না ইত্যাদি। ইদানীং টেলিফোনে আগাম 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করে যাওয়াটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রেও যত কম সময় থাকা যায় উভয় পক্ষই তত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন! তাছাড়া আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে বেশীক্ষণ থাকার সমস্যাও তো রয়েছে। থাকতে হলে তো কথাবার্তা বলতে হবে। 'অন্যের কাছে' নিজের কথা বলার ব্যাপারে অনেক রকমের সংশয় আজকাল আমাদের মনে কাজ করে। আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের মন বোধহয় অনেক সরল ছিল তাই তাঁরা প্রাণখুলে নিজেদের কথা বলতে পারতেন, আমরা যে কোন কারণেই হোক এই ক্ষমতা ক্রমাগত হা রিয়ে ফেলছি বলে আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যা (অবশ্য, যদি এটাকে আদৌ সমস্যা মনে করা হয়) বাড়ছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের আত্মীয়তার প্রতি মনোভাব সামগ্রিকভাবে আরও নেতিবাচক। কাকার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার চেয়ে টি.ভি.তে সিনেমা দেখা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। নিজস্ব পরিবারের গণ্ডির বাইরের আত্মীয়দের স াথে আমাদের সম্পর্ক থাকাটা আজকাল অনেকটা নির্ভর করে আমাদের পরিবারের কোন বয়োঃজ্যেষ্ঠ সদস্যের ওপরে। তিনিই আমাদের সাথে আত্মীয়দের সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই আত্মীয়তার বৃত্ত অ াবর্তিত হয়। আত্মীয়তা রক্ষার জন্য তাঁর এই আগ্রহ অনেকসময়ই আমাদের কাছে 'ভীষণ অস্বস্তিকর' বলে ঠেকে। এই অ াগ্রহের কারণে তাঁকে নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে অনেক গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বয়ে াঃবৃদ্ধের আন্তরিকতাকে আমরা বুঝে উঠতে পারি না বা বোঝার চেষ্টাও করি না। পুরো ব্যাপারটাকেই একটা 'ব্যাক ডেটেড' মানসিকতার প্রকাশ বলে ধরে নিই এবং নিজেদের আধুনিক মানসিকতাকেই এক্ষেত্রে সঠিক বলে বিশ্বাস করি। সত্যিই এই আধুনিকতা কতটা 'মানবিক' সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

একথা মনে হতেই পারে যে বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা দূরবর্তী পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে আমরা কিছুটা উদাসীন হয়ে থাকলেও একক পরিবারের সদস্যদের সাথে আমাদের নৈকট্য এখনও পাশ্চাত্ত্যের যে কোন সমাজের চোখেই ঈর্ষণীয়। এই দাবীর যার্থার্থ্যকে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। অনেক উন্নত দেশের মানুষই এখনও আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের বাঁধন দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁদের সমাজে এই নৈকট্য সম্ভব নয় বলে আফশোস করেন। এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্ত্যের মানুষদের কাছে আমাদের পারিবারিক কাঠামোর যে দিকটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হয় তা দাঁড়িয়ে আছে মূলত দুটি বিষয়ের ওপর ঃ প্রথমটি হল একক পরিবারের মধ্যেও বয়োজ্যেষ্ঠকে যথেষ্ট সম্মান দেবার মানসিকতা। এমন কি যখন এই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি সংসারের প্রকৃত কর্তা ন'ন তখনও তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন করার ব্যাপারে অনেক অনুজই কুণ্ঠিত হ'ন না, বিশেষ করে বিদেশীদের সামনে তো নয়ই! দ্বিতীয় বিষয়টি যা বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সৌহ ার্দ্যের সম্পর্ক। বিদেশী সমাজে, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য সমাজে এই দুটি বিষয়ের অভাব যতটা প্রকট আমাদের দেশে এখনও তার ভগ্নাংশও নয়। কিন্তু তা বলে এক্ষেত্রেও আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ রয়েছে কি?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে একক পরিবারের ক্ষেত্রেও সম্পর্কহীনতার বীজ আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিচ্ছে। একদিকে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলছে। অন্যদিকে বাড়ছে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা। নির্যাতিত নারীদের নিয়ে কাজ করেন যে সব সংস্থা তারা ক্রমাগত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন নির্যাতিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে। যে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখনও পুত্র বা কন্যার সাথে একই সংসারে রয়েছেন তাঁদের অনেকেই সমবয়স্কদের সাথে কথা বলার সময়ে অথবা জনান্তিকে বলছেন 'এর চেয়ে বৃদ্ধ াশ্রমে থাকা ভাল।' অন্যভাষায় বলা যায়, একক পরিবারের বাঁধনেও টান পড়ছে। সেই টান এখনও বহিরঙ্গে তেমন প্রক াশ না পেলেও ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ের ইঙ্গিত!

একসময়ে মনে করা হয়েছিল একমাত্র একক পরিবারেই পারিবারিক সুখ সম্ভব। মনে করা হয়েছিল ঘনিষ্ঠ মানবিক সম্পর্ক একক পরিবারেই দীর্ঘায়িত হতে পারে। এমনও অনেকে দাবী ও আশা করেছিলেন যে একক পরিবারে থাকলেই পরিব

ারের বাইরে অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা সম্ভব। বাস্তবে ঘটল অন্যরকম। কারণ পরিবারের বাইরের অ াত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য যে ইচ্ছেটা দরকার সেটাই মরে যেতে থাকে 'একা' থাকার ফলে। একক পরিবার অ ামাদের ইচ্ছের গতি-প্রকৃতিটাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। অনেকের সাথে থাকলে আমাদের বেশ কিছু ইচ্ছে পূরণের সুযোগ থাকে না, একথা ঠিক। কিন্তু ওই ইচ্ছেগুলো পূরণ না হওয়ার অভাব বোধটা চলে যায় অনেকের সাথে কষ্টটা ভাগ হয়ে য াওয়ায়। তাছাড়া অনেকের সাথে থাকার যে একটা পৃথক স্বাদ ও আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দও ব্যর্থতা বোধকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। কিন্তু একক পরিবারের 'অনেকের সাথে সম্পর্কের মজা' পাওয়ার অবকাশ থাকে না বলে ইচ্ছ াপূরণের অভাব হলেই দুঃখের সৃষ্টি হয়। ইচ্ছেপূরণের অভাবও যে বৃহত্তর কোন প্রাপ্তির কারণ হতে পারে সে বোধ গড়ে ওঠার সুযোগ না থাকায় ইচ্ছেপূরণ না হলে তাতে দু ধরণের কষ্টের সৃষ্টি হয়। যার ইচ্ছেপূরণ হল না সে দুঃখ পায় এবং যে ইচ্ছেপূরণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল তার মনে ব্যর্থতা বোধের জন্ম হয়। এই দুঃখ ও ব্যর্থতাবোধই কালক্রমে একক পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাহত করে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার, সন্তানদের প্রতি বাবা-মায়ের ব্যবহ ার সবই ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে উঠতে শু করে। আমেরিকায় গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশী একাকীত্ব বোধের শিকার হচ্ছে। এবং এই একাকীত্বের মূলে অন্যতম প্রধান কারণ হল বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্কহীনতা। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের চাহিদাপূরণে ব্যর্থ হয়ে বাবা-মায়েরা ধরেই নেন যে ওরা তাঁদের ওপর আর নির্ভরশীল নয়। অন্যদিকে ছেলেমেয়েরাও মনে করতে থাকে বাবা-মা তাদের ভালবাসেন না। ফলে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং এর নীটফল হয় সম্পর্কহীনতাজনিত একাকীত্ব। আমাদের সমাজেও একক পরিবারের সদস্যেরা ক্রমাগত একে অপরকে চাহিদা পূরণের যন্ত্র হিসেবে দেখতে বেশী মাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। ফলে পারস্পরিক সহনশীলতার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্যে তো পারিবারিক সম্পর্কের 'বোঝা'কে অস্বীকার করার জন্য পরিবার প্রথার বিদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা শু হয়ে গেছে। এই জেহাদ আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাবে তা অবশ্য এখনও সংশয়িত। আমাদের সমাজে এখনও আমরা পুরনোপন্থীদের দলেই রয়ে গেছি। এখনও আমরা অন্তত নিজের পরিবারের মধ্যে মানুষকে কাছে চাই। অবশ্য আমাদের এই চাওয়া কতটা মেটে সে হিসেব খুব পরিষ্কার নয়। অনেক সময়ই আমরা বুঝতে পারি যাকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল তারও মনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি না। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা ধার করে বলা যাক ঃ

"যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে
একদিন থেমে যাই, কেননা এমন দূর পথ
যেতে হবে, তাও তো ছিল না জানা .....।"
(কাছাকাছি মানুষের)

হঠাৎ একদিন যখন খুব কাছের লোককে এভাবে অচেনা লাগে সেদিন আমরা, একক পরিবারের ঘনিষ্ঠরা, বুঝতে পারি ঃ "যে কথা তোমার নয়, যে কথা আমার নয় / সকলেই সেই কথা বলে।" ক্রমশ এই নৈর্ব্যক্তিকতা-বৃদ্ধির বোধ কি একক পরিবারের মানুষের কাছে খুব অচেনা?

৩।

প্রশ্ন হল, ক্রমবর্ধমান সম্পর্কহীনতার জন্য দায়ী করব কাকে? নিজেদের, না কি নিজেদের ওপরে চেপে বসা সমাজব্যবস্থাকে? যদি বলা হয় দুটোই দায়ী তাহলে প্রশ্ন হবে কোনটা বেশী দায়ী? এধরনের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু উত্তরের সন্ধান না করে থাকাটাও কি কঠিন নয়? সম্পর্কহীনতাকেই অনিবার্য পরিণাম বলে মেনে নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কি খুব স্বস্তির? কাজেই উত্তর পাওয়া যাক বা না যাক উত্তর সন্ধান অন্তত কাম্য। কেন এমন হল? কেন মানুষ মানুষের ক াছ থেকে এভাবে দূরে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন একাকী হয়ে বাস করছে?

আর্থসামাজিক কারণের দিকে যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা বলবেন ভোগবাদী বাজার সর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। কোন্‌টা মূল্যবান কোন্‌টা নয় সে সম্পর্কে ধারণা এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে দেয় যে মানবিক সম্পর্কটা সেখানে কোন ভাবেই প্রাধান্য পেতে পারে না। মনে রাখতে হবে মানবিক সম্পর্ক ‘বাজারে’ বিক্রীযোগ্য সামগ্রী নয়। উল্টোদিকে এই সম্পর্ককে গুরুত্ব দিলে ভোগবাদী বাজার অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই বিশ্বায়নের যুগে, পণ্য সর্বস্বতার যুগে মানবিক সম্পর্ককে কিছুতেই ‘মূল্যবান’ হয়ে উঠতে দেওয়া যায় না এটা সহজ বোধ্য। বিশ্বায়ন কীভাবে মানুষের মনের ওপরে প্রভাব ফেলে এবং কীভাবে মানবিক সম্পর্কের অন্তরায় হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে যত্নশীল বিশ্লেষণ পাওয়া যায় গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা “বিশ্বায়নের মন” প্রবন্ধে। তিনি লিখছেন, “আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের প্রধান সুর উপযোগবাদ বা সুখবাদ। এর শূন্যতার দিকটি হল সে সুখ জিনিষটাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখে। তাই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সুখের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় হয়ে ওঠে, সুখের পারস্পরিক নির্ভরতাকে সে চিনতে পারে না। মানুষের আনন্দের পরিপূরকতা স্বীকৃতি পায় না। জাতিকে অখণ্ড এক সত্তা হিসেবে অনুভব করার ক্ষমতা হারিয়ে দার্শনিক ভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে সমাজ। সুখের খণ্ডিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ ও সুখের জাতীয় অখণ্ডতার চিরকালীন দ্বন্দ্বে ব্যক্তিসুখের পতাকা উড়তে থাকে।” বলা বাহুল্য নিজেকে নিঃশেষ করে পাওয়া এই সুখ মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে না। ফলে, “একেকটা মানুষের সারাটা জীবন শুধু দৌড়ে পর্যবসিত। সামগ্রিক ভাবে মানুষের আচরণ আমূল পাল্টে যায়। প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ততা যেমন নিয়ে আসে বন্যা, মহামারী, যা আমাদের কাম্য নয়। তেমনি বাজারের সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ততাও সমাজকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। যার উদাহরণ ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড। পৃথিবীর খোলা বাজারের দেশগুলির ক্রমবর্ধমান হতাশা, অবসাদ, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা ও আত্মহত্যা বিশ্বায়নের ভয়ঙ্কর দিকেরই ঘন্টাধ্বনি।” আমাদের সমাজে এই ভয়ঙ্কর বাজার ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি থাবা বসাতে না পারলেও বিপদ খুব আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। তার ইঙ্গিত আমরা পাই সমাজমনে বেড়ে ওঠা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে। একদিকে নিরাপত্তাহীনতা, অন্যদিকে ভোগবাদের অন্তহীন আকর্ষণের মধ্যে পড়ে আমাদের মূল্যবোধ ক্রমাগত বিপর্যস্ত হচ্ছে। আমরা শ্রেয়ঃ কে ফেলে প্রেয়র পিছনে দৌড়চ্ছি। আমরা মনে করছি যত বেশী আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে আমরা ততই ভাল থাকব। এই ‘ভাল থাকার’ চেষ্টায় কখন যে আপনজনদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি বুঝতেও পারছি না। অথবা বুঝতে পারলেও কিছুই করে উঠতে পারছি না। সম্পর্কহীনতা বাড়ছে কি না এ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে দেখতে পাবেন বেশীর ভাগ মানুষই মনে করেন তারা বাধ্য হয়ে সম্পর্কহীনতাকে মেনে নিচ্ছেন। অনেকেই বলবেন ‘সম্পর্ক আগের মতোই আছে, তার প্রকাশই শুধু পাল্টে গেছে।’ কিন্তু রাতের সব তারাই কি সত্যিই দিনের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে? আসলে, সম্পর্কটা থাকুক এই ইচ্ছেটা রয়েছে আমাদের মনে। অথচ এই ইচ্ছেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যা কিছু কর্তব্য তার ঠিক বিপরীত কাজটাই করে চলেছি আমরা। এইভাবে ক্রমাগত আত্মপ্রতারণা করে চলেছি। এটা এক ধরনের আত্মবিচ্যুতিও বটে। অনেকেই বলবেন কার্ল মার্কস্‌ তো অনেকদিন আগেই সতর্ক করে গেছেন এই আত্মবিচ্যুতি অথবা আত্মবিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনার বিষয়ে। প্রশ্নটা সেখানেই, সম্পর্কহীনতার যন্ত্রণা অনিবার্য জানার পরও এত বোদ্ধা মানুষ ভোগবাদী ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছে কী ভাবে? সত্যিই কি আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষের সাথে, বিশেষ করে নিকটজনের সাথে সম্পর্ক একটা মূল্যবান বিষয়? সম্পর্কহীনতা কি সত্যিই আমাদের কোন বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে? রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানবিক সম্পর্কহীনতা মানবসমাজের সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী। যে ধরনের ঐশ্বর্য সন্ধান মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “এ কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ বিকাশের ক্ষেত্র কেবলই সঙ্কীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরী করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ পোরণ করেই সমাজে।” রবীন্দ্রনাথের কথাকে ভাববাদী কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যেতেই পারে, কই পাশ্চাত্যে এত সম্পর্কহীনতা সত্ত্বেও তো সেই সমাজে মানুষের সুখ এতটুকু কম নয়। মনে হতে পারে যে মানবিক সম্পর্ককে জিইয়ে রাখতে না পারলেও তার বিকল্প ব্যবস্থা হয়তো করা সম্ভব এবং সেই বিকল্পের জোরে সমাজ কাঠামোও টিকে থাকতে পারে। পাশ্চাত্যে নানা রকম সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তো মানবিক সম্পর্ক থেকে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে যথাস্থানে। বিপদে পড়লে সেই বিপদ

থেকে রক্ষার দায়িত্ব যদি সরকার নেয় তাহলে খামোকা পাড়াপ্রতিবেশী কেন একে অপরের বিপদে ঝাঁপাতে যাবে? নিঃসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখার দায় যদি সরকারী হোমের ওপরে বর্তায় তাহলে ওই বৃদ্ধের সুখী সন্তানদের সুখ নিয়ে টান াটানি করার কি দরকার? স্ত্রীর দায়দায়িত্ব না বহন করে যদি লিভ টুগেদারের মাধ্যমে পরস্পরের আবেগজনিত প্রয়ে াজনকে মেটানো যায় তাহলেও কি 'সমাজের ভাল' করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী পারিবারিক সম্পর্কে ঢোকাটা আবশ্যিক?

লক্ষ্য কন, ওপরে যে প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে সেগুলিকে 'স্রেফ ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার' ফসল বলে চালিয়ে দেওয়া এবং প্রশ্নে অভিপ্রেত উত্তরগুলিকে মেনে নেওয়া খুবই সহজ কাজ। এবং এই সহজ কাজের বিপরীতটা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলেই হয়তো আমরা ইচ্ছে করেই সম্পর্কহীনতা অনুকূল অবস্থাগুলোকে মেনে নিই। অর্থাৎ সম্পর্কহীনতা কেবলমাত্র একটা সিস্টেমের ফসল হয় তো নয়। ওই সিস্টেমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আমাদের ইচ্ছেগুলোও হয়তো এই পরিণতিকে মেনে নেওয় ার অন্যতম কারণ। যারা মনে করেন মানুষের ইচ্ছে সবসময়ই পরিস্থিতির অধীন তারা নিশ্চয়ই বলবেন ভোগবাদী সমাজে এই ইচ্ছের থেকে ভিন্ন আর কোনও ইচ্ছে সম্ভব নয়। বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে। এমন অনেক মানুষ এখনও রয়েছেন যঁ ারা ভোগবাদী ইচ্ছের হাড়িকাঠে গলা দেন না। তাঁরা কি করে পারলেন? পারা তা হলে সম্ভব। কিন্তু এই অন্যরকম ইচ্ছে তোলার প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা যতক্ষণ না সতর্ক হচ্ছি, ততক্ষণ এই ইচ্ছে জেগে উঠতে পারেনা। যদি একথা মানুষ বুঝতে পারে যে সম্পর্কহীনতা তার নিজের ক্ষতি করবে তাহলেই মানুষ সতর্ক হবে।

প্রশ্ন হল সম্পর্কহীনতার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কবি-দার্শনিকেরা ছাড়া বিজ্ঞান চর্চাকরী লোকেরা কি কিছু বলেছেন? যেহেতু যুগটা বিজ্ঞানের তাই বিজ্ঞানীদের দিকে তাকানোটা প্রাসঙ্গিক।

মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাসলো এবং কার্ল রাজর্স মানবতাবাদী বিজ্ঞানী বলে প্রসিদ্ধ। মনোবিজ্ঞানে যান্ত্রিকতাবাদের বিরে াধিতা দুজনেই করেছেন যথাসাধ্য। মাসলোর মতে মানুষের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ নির্ভর করে তার কয়েকটি মৌলিক চ াহিদা পূরণ হওয়ার ওপরে। চাহিদাগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজালে এরকম হবে প্রথম চাহিদা বেঁচে থাকার রসদের, দ্বিতীয় চা হিদা নিরাপত্তার; তৃতীয় চাহিদা ভালবাসা পাওয়া এবং কারও সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার, চতুর্থ চাহিদা আত্মসম্মানের এবং চূড়ান্ত চাহিদা হল আত্মোপলব্ধির। মাসলো মনে করতেন চূড়ান্ত চাহিদাটি সব মানুষের পক্ষে পূরণ করা না সম্ভব হলেও ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের জন্য চতুর্থস্তর পর্যন্ত চাহিদাগুলি মেটা দরকার। মানব সমাজে সম্পর্কহীনতা যদি সর্বস্তরে দেখা দিতে থাকে তাহলে মানুষ কোনক্রমেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের তৃতীয় স্তরটি সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করতে পারবে না। ফলে পরবর্তীস্তরও তার কাছে অধরা থেকে যাবে। আত্ম সম্মানের স্তরে মানুষ পৌঁছতে না পারলে সে হবে হীনম্মন্যতার শিকার এবং এই হীনম্মন্যতার পথ ধরে তার জীবনে দেখা দেবে আরও নানান মানসিক সমস্যা। পাশ্চাত্ত্য যখন স ম্পর্কহীনতার জয় জয়কার করছে ঠিক তখনই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মানসিক রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে, এবং এই দুটি ঘটন ার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই এই দাবী এখনও কোন মনোবিজ্ঞানী করেন নি। মাসলোর মতোই রাজর্সও বলেছিলেন সম াজের একজন ব্যক্তি যদি অন্যকে শর্তহীনভাবে ভালবাসা দিতে শেখে তবেই সমাজে সুস্থ মনের বিকাশ সম্ভব হবে। স ম্পর্কহীনতা যদি শেষ কথা হয় তাহলে মানুষের মন তা শেষ পর্যন্ত মেনে নেবে না সে কথা মনে রাখতে পারলেই হয়তো আমরা সম্পর্কহীনতাকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়ার বিদ্ধে খে দাঁড়াতে পারব। তা না হলে পাশ্চাত্ত্যের মতো আমাদেরও হয় তো মানবিক সম্পর্কের স্পর্শ পাওয়ার জন্য পেশাদার মনোবিজ্ঞানীদের কাছে যেতে হবে।

৪।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এখানেই যে আমরা জীবনের সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করার কোন শিক্ষাই পাঠক্রম থেকে পাইনা। বিদেশে এই মুহূর্তে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শেখানোর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে পাঠ্যসূচীতে। সম্পর্কহীনতার বিপদ সম্পর্কে যদি মানুষকে সময় থাকতে অবহিত করা যায়, যদি সুস্থ স

স্পর্ক কী ভাবে বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ ছাত্রজীবন থেকে থাকে তাহলে মানুষকে অনেক ম ানসিক বিপর্যয় থেকেই হয়তো রক্ষা করা যেতে পারে। একথা অবশ্যই সত্যি যে ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে অধীত এই শিক্ষাকে কার্যকরী করা কষ্টকর, কিন্তু এর বিকল্পও তো এই মুহূর্তে হাতের কাছে নেই।

অন্য যে বিকল্প এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে তা হল বাজার অর্থনীতির তত্ত্বে এমন পরিবর্তন আনা যা মানসিক মূল্যবোধগুলিকে যাথযথ গুত্ব দেবে। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতিকে যদি কোন তত্ত্বের মাধ্যমে মূল্যবোধের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করা যায় তাহলে মানুষের সুখের সন্ধান হয়তো তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাহত করবে না। কিন্তু এ ধরনের তত্ত্ব শুধু তৈরী হলেই তো হবে না, বাজার অর্থনীতির ধারক বাহক পৃথিবীকে এই তত্ত্ব তো প্রয়োগ করতে হবে। সেটাও তো একটা মূল্যবোধের ওপরই নির্ভরশীল। অর্থনীতিবিদেরা এই মূল্যবোধ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কতটা সঞ্চারিত করতে পারেন তার ওপরেই নির্ভর করবে মানবিক সম্পর্কহীনতার সমস্যা সমাধানে অর্থনীতির কার্যকারিতা।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com